দৈনিক ইত্তেফাক

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা সুশাসন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

প্রকাশ : ২০ অক্টোবর ২০১৯, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয় তদারকি এবং অনুমোদনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে কঠোরভাবে আইন অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে সরকারি-বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেই যথাযথ আইন অনুযায়ী চলার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজগুলোর পাশাপাশি বেসরকারি কলেজগুলোকেও তিনি ইউজিসির নজরদারিতে আনার নির্দেশ দিয়েছেন। এছাড়া তিনি পাশাপাশি কমিশনের ক্ষমতা ও সামর্থ্য বাড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন। এটি উচ্চ শিক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের সঙ্গে ছাত্র সমাজের ১১ দফার ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৬৯ সালের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দেওয়া ১১ দফার অন্যতম একটি দফার অনুচ্ছেদ (১. (খ) ছিল 'কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় কালাকানুন সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে।' এজন্যই আমরা দেখতে পাই উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ঘোষণা করা হয়েছিল, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে চিন্তার স্বাধীনতা ও মুক্ত-বুদ্ধিচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করা। এই অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, যা মুক্তবুদ্ধির চর্চার পথকে সুগম করে। স্বাধীনা-উত্তর বাংলাদেশে মানসম্মত উচ্চশিক্ষার গুরুত্বকে অনুধাবন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেই সময়ে ইউজিসির কার্যক্রম ছিল তৎকালীন ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক প্রয়োজনীয়তা ও চাহিদা নিরূপণ করা। কিন্তু এখন আমাদের দেশে শুধু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৫টি। এছাড়া রয়েছে শতাধিক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কি শুধুই শিক্ষাদান বা পঠন-পাঠন। নিশ্চয়ই নয়। প্রকৃতপক্ষে একটি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদানের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা জাগিয়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত করে। বৃটেনে যখন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিটি গঠিত হয়েছিল, তারা এধরনেরই মন্তব্য করেছিল। পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যের সঙ্গে

বেশ কয়েকটি বিষয় যুক্ত হয়েছিল যেমন শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ মানসিকতা ও উচ্চ মানসম্পন্ন মনন সৃষ্টির জন্য প্রয়াসী হওয়া, শিক্ষার্থীদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিটি দিকে নেতৃত্ব দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাবলি সম্বন্ধে তীব্র সচেতনতা গড়ে তোলা, বিভিন্ন বিষয়ে নিরাসক্তভাবে সত্যের সন্ধানে ব্রতী হওয়া, চিন্তাভাবনার স্বাধীনতার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা। কিন্তু আমরা বা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আদৌ এই ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারছে কি না সে বিষয়ে আমাদের একটু দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। যেমন বাংলাদেশের প্রায় সবকটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ৭ অনুচ্ছেদে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের মাত্র ছয়টি বিষয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য অবশ্যই আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। একটি বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার উন্মুক্ত জায়গা হিসেবে কী ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করবে বা করা উচিত? সে বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসনবিদ স্যার জেমস মাউন্টফোর্ড ছয়টি স্বাধীনতার কথা বলেছেন। এগুলো হলো–১. শিক্ষার্থী নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা; ২. শিক্ষক নির্বাচনের স্বাধীনতা; ৩. পাঠ্যক্রম স্থিরকরণের এবং বিভিন্ন ডিগ্রির মান বজায় রাখার স্বাধীনতা; ৪. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তৃতির সীমা নির্ধারণের ক্ষমতা; ৫. পঠন-পাঠন, গবেষণা ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতা; ৬. পৌনঃপুনিক আয় প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো খাতে ব্যয় করার স্বাধীনতা। প্রকৃতপক্ষে এগুলোই হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসন বা স্বায়ত্তশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান নির্বাহী হিসেবে মাননীয় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বা সিন্ডিকেট বা রিজেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে এগুলো কার্যকর করে থাকেন। যদিও আমরা প্রচলিত অর্থে মনে করি বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরদের কার্যক্ষমতা একই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। একেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে একেক রকম দায়িত্ব পালনের কথা বলা আছে। এজন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কর্তব্য বা দায়িত্বের সঙ্গে অধুনা প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব মেলে না। যেমন বিভিন্ন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ১১ নম্বর অনুচ্ছেদে মাননীয় উপাচার্য মহোদয়দের ১৫টি দায়িত্ব সুস্পষ্ট করে দেওয়া আছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আইনে প্রো ভাইস চ্যান্সেলর, ট্রেজারারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তাদের ভূমিকা বা দায়িত্ব কম নয়। কিন্তু অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পদগুলো শূন্য রয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশাসনে এই পদগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। যদিও এক্ষেত্রে ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয় এসব পদ পূরণ করতে দিতে নারাজ থাকেন। তারা মনে করেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর বা ট্রেজারার নিযুক্ত হলে তাদের একচেটিয়া কার্যক্ষমতা হারিয়ে যাবে। আমি একবার কোনো এক ভিসিকে বলতে শুনেছিলাম, 'আমার প্রতিষ্ঠানে প্রো-ভিসি দিলে আমি চলে যাব'। আবার কেউ কেউ বলেন, প্রো-ভিসি বা ট্রেজারার নিষ্প্রয়োজন। কারণ, তাদের অনুপস্থিতিতে প্রয়োজনীয় কার্যাদি ভিসি মহোদয়ের পক্ষেই করা সম্ভব। কে জানে এমনি কেউ হয়তো গিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে স্ব স্ব আগ্রহের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও করে থাকতে পারেন। তাদের ধ্যানধারণায় ছোটো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রো-ভিসি কিংবা ট্রেজারার নিয়োগ অহেতুক অর্থ অপচয়। কিন্তু একটি বিশ্ববিদ্যালয় তাদের হিসাবে ছোটো কিংবা বড়ো যা-ই হোক, তার সমুদয় কর্মকাণ্ড একজন ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি তথা উপাচার্য মহোদয়ের পক্ষে করা কঠিন; ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। তার পরেও অজ্ঞাত কারণে সরকারের পক্ষ থেকেও প্রো-ভিসি কিংবা ট্রেজারারের শূন্যপদ পূরণে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয় না। তবে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষায় সুষ্ঠু পরিবেশ ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে (অনেকে ভাষায় ছোটো কিংবা বড়ো যা-ই হোক) প্রো-ভিসি পদটি যেহেতু রয়েছে সুতরাং তা কার্যকর করা উচিত। বিশ্বের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি আমাদের দেশের প্রায় বড়ো কটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে) দুজন করে প্রো-ভিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যদিও দু-এক জায়গায় এখনো একাডেমিক এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব সেভাবে বণ্টন করে দেওয়া হয়নি। আমার মনে হয়েছে, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় এবং গোপালগঞ্জের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি বুয়েটেও যদি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর থাকতেন; তবে যা-ই হোক মাননীয় উপাচার্য মহোদয়কে অমন অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হতো না।

এ কথা বলতে আর দ্বিধা নেই, সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আইনের যথাযথ প্রয়োগ আর সুশাসন নিশ্চিতকরণের অভাবে নানা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালানার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এবং উপযুক্ত আইনের অনুপস্থিতি কিংবা তার যথাযথ প্রয়োগের দুর্বলতায় গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো শূন্য করে রাখার একটা অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করলে বলতে হয়, কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একজন প্রো-ভিসি কিংবা ট্রেজারারের নিয়োগ বাদেই তার এক দশক উদযাপন করতে যাচ্ছে। তবে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রীয় বিধি না মানার (বিশেষত, আর্থিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে) ফলে সংশ্লিষ্টদের মাঝে সীমাহীন ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করা যায়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনবোধে কর্মক্ষেত্রে সততা, দক্ষতা ও আন্তরিকতার পরিচয় দেওয়া প্রজ্ঞাবান এবং উপযুক্ত প্রো-ভিসি মহোদয়দের মধ্যে থেকে পরবর্তীকালে উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রেও বিবেচনা করতে পারেন। সেক্ষেত্রে বিশেষ করে সিনেটবিহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুব সহজেই স্ব স্ব কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক বিন্যাসের মাধ্যমে একজন দক্ষ শিক্ষা প্রশাসক প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। সামপ্রতিক সময়ে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচনের সংকট বেশ ঘনীভূত।

উচ্চশিক্ষা এখন কেবল উচ্চবিত্তের জন্য নির্ধারিত রয়েছে–এমনটি নয়। বরং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পর টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যেতে থাকা বর্তমান বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে দৃশ্যমান অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরাও উচ্চশিক্ষা অর্জনে বেশ এগিয়ে গেছে। তাদের কেউ কেউ অদম্য মেধাবী হিসেবে পুরো দেশ ও বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। পরিতাপের বিষয় হলেও সত্যি বিভিন্ন রকম অসুবিধা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যে এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে হচ্ছে। সীমিত সুযোগ এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানের উদাসীনতায় তাদের মনে নানাবিধ ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কয়েকটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তাদের এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ আমরা ঘটতে দেখেছি। শিক্ষার্থীদের আমরা ভালো শিক্ষক দিতে পারছি না, বৃত্তির পরিমাণ নিতান্ত অপ্রতুল, আবাসিক ও বিদ্যায়তনিক সুবিধার স্বল্পতা তাদের ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে যোগ্য, দক্ষ এবং পাঠদান ও গবেষণায় আন্তরিক শিক্ষক ছাড়া যেমন আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরি হয় না, একইভাবে পুরো প্রক্রিয়াতে যদি প্রশাসনের নিয়মিত তদারকি না থাকে কেবল অর্থ-সহায়তায় ভালো শিক্ষার্থী সৃষ্টি হবে না। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থায় কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্রায়ন, জবাবদিহিতা, সুশাসন এবং তদারকি নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে।

n **লেখক: প্রফেসর ড. মো. আনোয়ারুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)**

anwarhist@gmail.com

ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিঃ-এর পক্ষে তারিন হোসেন কর্তৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও মুহিবুল আহসান কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, কাজলারপাড়, ডেমরা রোড, ঢাকা-১২৩২ থেকে মুদ্রিত।